বার্ধক্যযাত্রার মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা

এরিক ফ্রম

[এরিক ফ্রমের (১৯০০-১৯৮০) বিশ্বব্যাপী পরিচিতি মনোবিশ্লেষক ও মানবতাবাদী সমাজ মনোবিজ্ঞানী হিসেবে । সদর্থক মনোবিজ্ঞানের (positive psychology) ধারার একজন গণ্য করা হয় তাঁকে। **"The Psychological Problems of Aging"** প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় *Journal of Rehabilitation* এর অক্টোবর ১৯৬৬ সংখ্যায়। বর্তমান অনুবাদের জন্যে ফ্রমের *On Disobedience and Other Essays* (১৯৮১) গ্রন্থ থেকে এটি সংগ্রহ করা হয়েছে। –অনুবাদক]

বার্ধক্যযাত্রার মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা বিষয়ে প্রধান প্রশ্নগুলোর একটি যার উত্তর আমাদের করতে হবে তা হচ্ছে: বৃদ্ধ বয়সটা কি অস্বস্তিকর কিছু? এটা কি এমন এক অপসৃয়মান বেদনাদায়ক ধাপ যাকে সব রকম বুলি দিয়ে আপাতমধুর ক'রে তুলতে হবে? নাকি এটা শৈশব, কৈশোর, মধ্যবয়সের মতোই জীবনের একটা ধাপ মাত্র? সমস্যাটা কি বাঁচার সকল ধাপের সমস্যার অনুরূপ নয়, অর্থাৎ, কীভাবে আমরা উত্তমরূপে বাঁচতে পারি এবং কীভাবে আমরা ওই বিশেষ ধাপটিতে সবচেয়ে প্রাণবান থাকতে পারি?

জীবনযাপনের একটা শিল্পকলার কথা তাৎপর্যপূর্ণভাবেই বলা যেতে পারে এবং সেকারণে বলা যেতে পারে যে শিশু হওয়া বা কিশোর হওয়ার শিল্পকলার মতোই বার্ধক্যযাত্রার শিল্পকলা জীবনযাপনের শিল্পকলারই একটি অধ্যায়।

খুব স্পষ্টত, বৃদ্ধ বয়সের সমগ্র সমস্যাটা আধুনিক শিল্পোন্নত সমাজের একটি সমস্যা। একশো বছর আগে বা এমনকি পঞ্চাশ বছর আগেও বৃদ্ধ বয়স ছিল খুবই বিরল। সেসময় নিজের নাতিনাতনি বা নাতিনাতনির সন্তানদের দেখে যেতে পারাটা ছিল এক বেজায় ব্যতিক্রমি ব্যাপার, অথচ আজকের দিনে হরহামেশাই তা ঘটে। এটা খুব পরিষ্কার যে বৃদ্ধ বয়স হচ্ছে এমন এক সমস্যা যাকে সৃষ্টি করেছে আধুনিক শিল্পোন্নত সমাজ। এটা মূলত চিকিৎসাবিদ্যার অগ্রগতির একটি সমস্যা যে-অগ্রগতি বিজ্ঞানে ও প্রযুক্তিতে সাধারণ অগ্রগতির একটি অংশ মাত্র।

এর পাশাপাশি, আমরা এমনকি বলতে পারি যে বৃদ্ধ বয়সকে শুধু জৈবিক বা শারীরবৃত্তিক ভাষাতে নয় সামাজিক ভাষাতেও সংজ্ঞায়িত করা যায়: বৃদ্ধ বয়স হচ্ছে এমন এক সময় যখন আপনাকে আর কাজ করতে হয় না। এমন সময় কখন আসে যখন আপনাকে আর কাজ করতে হয় না? – এ-প্রশ্নটি বহুলাংশে শিল্প সংগঠনের (industrial organization) একটি প্রশ্ন। আমরা কল্পনা করতে পারি যে ক্রমবর্ধমান যন্ত্রনির্ভরতার (automation) সাথে কর্মঘণ্টাই শুধু কমে আসবে না, কর্মের বয়সও অধিক থেকে অধিকতর মাত্রায় কমে আসবে। ফলে হয়তো আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পর চল্লিশোর্ধ যে কোনো বয়সই হবে বৃদ্ধ বয়স, কারণ চল্লিশের পরে কতিপয় ব্যতিক্রম ছাড়া আর কাউকেই কাজ করতে হবে না বা কাজের সুযোগ থাকবে না।

আজকের দিনে পাশ্চাত্য সমাজে আমরা শুধু যে দীর্ঘায়িত জীবনের অধিকারী তা নয়, এ দীর্ঘায়িত জীবনকে মর্যাদাপূর্ণ, আরামদায়ক, ও মনোরম করবার জন্যে দরকারী বৈষয়িক উপায়সমূহ থাকার সুবাদে আমরা যথেষ্ট ভাগ্যবানও। আমরা সবাই জানি পৃথিবীর জনসংখ্যার আধিক্যের সমস্যার একটি বড় কারণ হচ্ছে যে চিকিৎসাবিদ্যা ফলপ্রসূ হয়েছে। এ ফল থেকে উপকৃত হবার জন্যে যে-বৈষয়িক উপায়সমূহ দরকার শিল্পকারখানাগুলো তা উৎপাদন করে নি বা করতে পারে নি। এরকম পরিস্থিতিতে জনসংখ্যার আধিক্য থাকে, কিন্তু থাকে না দীর্ঘতর জীবন লাভকারী লোকেদের বস্তুগত প্রয়োজনসমূহের সেই অনুযায়ী পরিপূরণ। যুক্তরাষ্ট্রে এবং সব শিল্পোন্নত সমাজে, সাধারণত, আমাদের এই বস্তুগত উপায়গুলো আছে এবং তা ক্রমাগত বাড়ছে; ফলে এ-অসংগতি আমাদের নেই।

আমাদের আধুনিক শিল্পোন্নত সমাজ মানুষের জন্যে এক নতুন সমস্যা সৃষ্টি করেছে: বৃদ্ধ বয়স। এই বৃদ্ধ বয়সটাকে মানুষ নিরাপদে ও সুখে যাপন করতে পারতো যদি আধুনিক সমাজ অন্য কিছু প্রপঞ্চ (phenomena) সৃষ্টি না করতো। এ-প্রপঞ্চগুলো তেমন শুভ কিছু নয়, আর বার্ধক্যযাত্রার প্রশ্নটির উপরও এদের বিশেষ প্রভাব আছে। এ-সমস্যাগুলোর কয়েকটি সম্বন্ধে আমি আলাপ করবো এবং বার্ধক্যযাত্রার সমস্যাগুলোর সাথে এদেরকে যুক্ত করার চেষ্টা করবো।

আধুনিক সমাজ বিশেষ এক ধরনের মানুষ তৈরি করেছে যাদেরকে ইতিপূর্বে আমি নাম দিয়েছি homo consumens। এরা হচ্ছে ন'টা থেকে পাঁচটা অফিস করা ভোক্তা মানব (consumer man) যাদের প্রধান আগ্রহ ভোগ করায়।

এ হচ্ছে চিরকাল ধ'রে মাতৃস্তন্য পান ক'রে যাবার মনোভাব। এ-মনোভাব থাকে সে-সব পুরুষ বা নারীর যাদের মুখ হা করা থাকে গোগ্রাসে সবকিছু ভোগ করার জন্যে: কড়া মদ, সিগারেট, চলচ্চিত্র, টেলিভিশন, লেকচার, বই, প্রদর্শিত শিল্পকর্ম, যৌনতা। তারা যে কোনো কিছুকেই ভোগের বস্তুতে রূপান্তরিত করেন।

এসব ভোগ্যপণ্যের বিক্রেতারা নিশ্চয়ই এতে কোনো সমস্যা দেখতে পান না। তাঁরা ভোগের মনোভাবকে যতো বেশি পারা যায় উস্কে দিতে চেষ্টা করেন। আমি আমার নিজের পেশার কিছু জ্ঞান প্রয়োগ ক'রে বলতে পারি, এখানে খুব গভীর একটা গোলমাল আছে। কারণ আমরা জানি যে ভোগের এ-প্রবল বাসনার পেছনে আছে এক আন্তর রিক্ততা – এক শূন্যতার বোধ। আছে, বস্তুত, এক বিষণ্নতার বোধ, এক নিঃসঙ্গতার বোধ। এ যোগসূত্রের ক্লিনিক্যাল প্রমাণ আমরা পাই এ-ঘটনা থেকে যে অতিভোজন ও অতিক্রয়করণ (overbuying), প্রায়ই, বিষণ্নতা বা তীব্র উদ্বেগের

ফলে ঘটে। ব্যক্তি ভেতরে ভেতরে শূন্য বা অসহায় বোধ করেন এবং কোনোকিছু অন্তর্গ্রহণ ক'রে তিনি অনুভব করেন যে তিনি এমন কিছু একটা দিয়ে নিজেকে পূর্ণ করেছেন যা তাকে করেছে শক্তিমান।

স্বভাবত, এটা কোনো সচেতন চিন্তা প্রক্রিয়া নয়। তা হবার জন্যে এটা খুবই অচিন্তনীয়, তবে এটা সেসব অচেতন অভিজ্ঞতাসমূহের একটি যাতে আন্তর শূন্যতার উপশম হয় ভোগ দ্বারা – অশেষ ও অসীম ভোগ।

রাজনৈতিক আলাপচারিতায় যে-স্বাধীনতার কথা বলা হয় তাকে বাদ দিলে, বস্তুতপক্ষে, আমাদের স্বাধীনতার ধারণাটি বা সত্যিকার ধারণাটি হচ্ছে মূলত ক্রয় ও ভোগের স্বাধীনতার ধারণা। ঊনবিংশ শতকে স্বাধীনতার মানে বহুলাংশে ছিল ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্বাধীনতা এবং আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি দিয়ে আমি যা ভালো মনে করি তা করবার স্বাধীনতা। আজকাল, আমাদের সমাজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি, বেতন থেকে প্রাপ্ত আয়ের তুলনায়, অনেকটা অদৃশ্যমান। স্বাধীনতা ব'লে আমরা যা বোধ করি অনেকাংশে তা হচ্ছে কেনার বা ভোগ করার স্বাধীনতা। বহু বিভিন্ন রকম জিনিসের মধ্য থেকে বাছাই করা এবং বলা: "আমি এই সিগারেটটা চাই। আমি এই গাড়িটা চাই। অন্য কোনোটা নয় বরং আমি এটা চাই।" প্রতিদ্বন্দ্বী বহু ব্র্যান্ড সত্যিকার অর্থে পরস্পর থেকে খুব বেশি ভিন্ন নয়, আর ঠিক সেকারণেই ব্যক্তি বাছাইয়ের স্বাধীনতার মহাক্ষমতা অনুভব করেন। আমার মনে হয়, অনেক লোকই, যদি তাঁরা তাঁদের স্বর্গের ধারণা বিষয়ে সৎ হন, স্বর্গকে কল্পনা করবেন অপূর্ব এক বিপণিবিতান হিসেবে যেখানে তাঁরা প্রতিদিন নতুন কিছু কিনতে পারবেন এবং হয়তো প্রতিবেশিদের থেকে একটু বেশি পরিমাণে পারবেন।

এ-সদাবর্ধিষ্ণু ভোগের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে এক রকম অসুস্থতা আছে এবং বিপদটা হচ্ছে ভোগের প্রয়োজন দ্বারা পূরিত হবার মাধ্যমে মানুষটি সত্যিকারভাবে আন্তর নিষ্ক্রিয়তা, আন্তর রিক্ততা, উদ্বেগ ও বিষণ্ন হয়ে পড়ার সমস্যার সমাধান করেন না – কারণ জীবনটা তাঁর কাছে কোনো দিক থেকে যেনো অর্থহীন বোধ হয়।

পুরোনো টেস্টামেন্টে সতর্ক ক'রে দিয়ে বলা হয়েছে হিব্রুদের জঘন্যতম পাপকার্যটি ছিল এই যে তারা প্রাচুর্যের মধ্যেও নিরানন্দে বাস করেছিল। মনে হয়, আমাদের সমাজের সমালোচকগণও বলতে পারেন যে আমরা বিপুল মজা ও উত্তেজনা নিয়ে বাস করি, কিন্তু সেখানে প্রাচুর্যের মধ্যে আনন্দ (joy) থাকে সামান্যই।

যে-সহজ কারণবশত বার্ধক্যযাত্রীদের সমস্যা প্রসঙ্গে আমি এ-আলোচনা করছি তা হচ্ছে আমার আশঙ্কা যে বয়স্কদের মহাভোক্তাতে (super-consumers) পরিণত হবার এক মহাবিপদের সম্ভাবনা থাকে। তাঁরা এমন লোকে পরিণত হতে পারেন যাঁদের শুধু ন'টা থেকে পাঁচটা নয়, বরং ন'টা থেকে বারোটা পর্যন্ত ভোগ করার সময় থাকে, এবং যাঁরা ভোগকেই নিজেদের প্রধান কাজে পরিণত করেন। তাঁরা এমন লোকে পরিণত হতে পারেন তরুণরা যাদের একরকম অবজ্ঞা করে এবং যাঁদের এখন পরিপূর্ণ আলসে হয়ে যাবার ও *সময় কাটিয়ে (in killing time)* সময় ব্যয় করার সুযোগ আছে।

আমাদের এক অদ্ভুত স্বভাব হচ্ছে যে আমরা সময় বাঁচানোর জন্যে প্রবল চেষ্টা করি, তারপর বেঁচে যাওয়া সময় নিয়ে বিব্রত বোধ করি, কেননা আমরা জানিনা এ দিয়ে কী করবো। তখন আমরা সময় কাটাতে (to kill time) শুরু করি। আমাদের বিনোদন শিল্প আমাদেরকে দেখায় কী ক'রে নিজের অজ্ঞাতে নিজের সময় কাটাতে হয়। বিনোদন শিল্পের প্রভাবে আমরা বিনোদন ভোগ করি এ-সচেতন বিশ্বাস নিয়ে যে আমরা অর্থপূর্ণ কিছু একটা করছি। এভাবে আমাদের বিনোদন শিল্প আমাদেরকে নিজেদের অজান্তে নিজেদের সময় নষ্ট করার চর্চায় নিয়ে যায়। আমার মনে হয় বিশেষ একটা বিপদ আছে এরকম যে আমরা বার্ধক্যযাত্রীদেরকে রূপান্তরিত করতে পারি, তাঁদের সমস্ত সম্ভাবনা ও সমস্ত অবসর সময় সত্ত্বেও, এক মহাভোক্তাতে যিনি পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় এবং যিনি এমন উপায়ে সময় কাটান বিশেষজ্ঞগণ যাকে বলবেন *শোভন উপায় (decent way)*। আমার ধারণা, তা হবে এক বড় মনস্তাপের ব্যাপার।

বস্তুতপক্ষে, বৃদ্ধ বয়সটা এক বড় চ্যালেঞ্জ, এক মস্ত সুযোগ। এ-সময়টাই একজন মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় হতে পারে; কেননা এ সময় তিনি জীবিকা অর্জনের কাজ থেকে মুক্ত, চাকুরি হারানোর ভয় থেকে মুক্ত, পদোন্নতির জন্যে ঊর্ধ্বতনকে খুশি রাখার দরকার থেকে মুক্ত; তিনি সত্যিকার অর্থেই একজন মুক্ত মানুষ – আমরা ঘুমের মধ্যে যতোটা মুক্ত থাকি প্রায় ততোটা মুক্ত (আমাদের স্বপ্নসমূহ প্রমাণ করে যে ঘুমের মধ্যে আমরা অনেক বেশি সৃজনশীল হয়ে উঠি; আমরা এমনিতে নিজেরা নিজেদেরকে যতোটা সৃজনশীল মনে করি তার থেকেও বেশি সৃজনশীল।)

বৃদ্ধ মানুষেরই, ধরা যাক পঁয়ষট্টি-ঊর্ধ্ব বয়স যাঁর, সত্যিকার অর্থে বাঁচার সুযোগ থাকে। সুযোগ থাকে প্রাণবন্ত থাকার, জীবনযাপনকেই নিজের প্রধান কর্তব্য ক'রে তোলার। তাছাড়া এ-সময় জীবনের আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় সমস্যাগুলোকে অকৃত্রিমভাবে মোকাবেলা করতে পারেন তিনি। আমার মনে হয়, মানব জাতির অতীত ইতিহাসে এ সমস্যাগুলো নিয়ে গুরুত্ব দিয়ে ভাবার শক্তি বা সময় কোনোটাই সাধারণভাবে মানুষের ছিল না।

আপনি যদি গায়েখাটা শ্রমিক হন তাহলে আপনি খুব ক্লান্ত থাকেন, আর আপনি যদি গায়েখাটা শ্রমিক না হন তাহলে আপনার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও নিজের সাফল্য বিষয়ে আপনার অনিশ্চয়তা আপনাকে এমন ক্লান্ত ক'রে রাখে যে আপনি জীবনের সমস্যা বিষয়ে সত্যিকারভাবে চিন্তা করতে পারেন না। এগুলো নিয়ে আমরা মাঝে মধ্যে, সাধারণত রবিবারে, কথা বলি: জীবনের অর্থ কী? আমি কে? এ জগতে আমার স্থান কী? এসব জীবন যাপন আর কর্মকাণ্ডের হেতু বা উদ্দেশ্য কী? রবিবারের কোনো ধর্মোপদেশে (sermon) এ জাতীয় সমস্যার কথা শোনার সুযোগ আমাদের হতে পারে। কিন্তু সাধারণত কর্মদিবসে এসব বিষয়ে ভাববার মতো শক্তি বা সময় আমাদের থাকে না।

সম্পূর্ণ যন্ত্রনির্ভর যে-যুগ সামনে আসছে সে-যুগে মানুষ অবশেষে হয়তো সপ্তাহে শুধু দশ-বারো ঘন্টা কাজ করবে। তখনই, প্রথমবারের মতো, সে জীবনের আধ্যাত্মিক সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হবে।

বৃদ্ধদের ঠিক এই মূহুর্তেই এটা মোকাবেলার সুযোগ আছে। সুযোগ আছে এ প্রশ্নগুলো তোলার; তবে তত্ত্ব হিসেবে নয়, তাঁদের জীবনের সাথে জড়িত বিষয় হিসেবে। আমি কে? আমার জীবনের লক্ষ্য কী? আসলে জীবনের বিষয়টা কী? তাঁদের মোকাবেলা করার সুযোগ ঘটে মৃত্যুর প্রশ্নটিকে যা জীবন দর্শনেরই অংশ – যে-চরম বাস্তবতাকে কেউই এড়াতে পারে না – এবং সুযোগ ঘটে জীবনকে এ-দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যে এটি মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শেষ হয়।

যদি বলি যে মৃত্যুর সাথেসাথে জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে তাহলে পরকালের জগতে বিশ্বাসী খ্রিস্টান বা ইহুদীগণ তা মানবেন না। তা সত্ত্বেও, আমি মনে করি, একটা বিষয়ে তাঁরা আমার সাথে একমত হবেন: মৃত্যুপরবর্তী জীবন যদি থাকেও তবু সে-জীবন কোনো ভীষণ অচেনা দেশে পথপ্রদর্শক সহকারে পরিশোধিত-খরচার কোনো ভ্রমণের মতো হবে না। ওটা আনন্দ ভ্রমণ নয়। ওটা থাকবে কেবল যদি আমাদের এ-জীবনেই কিছু জিনিস ঘটে। এসব ঘটলে আমরা এমন ধরনের জীবনে অংশ নিতে পারবো যা বিভিন্ন ধর্মীয় সংশ্রয়ে (religious systems) বর্ণনা করা হয়েছে। মৃত্যুপরবর্তী জীবন বিষয়ে কোনো বিশেষ ধর্মীয় মত বা বিশ্বাস আমরা স্বীকার করি কিনা তা সত্যিকার অর্থে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়, কেননা তারপরও মৃত্যুর সমস্যাটিকে আমাদের গুরুত্বের সাথে নিতে হবে এবং একে আমরা আড়াল করতে বা উপেক্ষা করতে পারবো না।

জীবনের বিশেষ কিছু মৌল সমস্যাকে গুরুত্বের সাথে নেয়ার প্রশ্নটিকে এতোক্ষণ আমরা খতিয়ে দেখেছি। এখন এ-প্রশ্নটির কীভাবে উত্তর করা যায় তা বিবেচনা করবো। ভোক্তার বিপরীত মানুষটি কীরূপ? শূন্য, নিষ্ক্রিয় যে-মানুষটি সময় কাটিয়ে জীবন ব্যয় করেন – বা আমি বলবো *নষ্ট করেন* – তার বিপরীত মানুষটি কীরূপ?

এর বর্ণনা করা খুব কঠিন, কিন্তু আমি বলবো, সাধারণভাবে, মূল উত্তরটি হচ্ছে আগ্রহী হওয়া (to be interested)। দুর্ভাগ্যবশত, শব্দটি আমরা এতো ঘন ঘন ব্যবহার করি যে এটা এর অর্থের এক বড় অংশকে হারিয়ে ফেলেছে। এ-হারানো অর্থ নিহিত আছে এটির শব্দমূলকে ল্যাটিনে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় তাতে: inter-esse, অর্থাৎ, কোনোকিছুর "মধ্যে থাকা" ("to be in" something); এর অর্থ নিজের অহংকে অতিক্রম করতে পারা, আমার সব উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আমার সম্পত্তির গরিমা, আমি যা জানি ও আমার পরিবার ও আমার স্ত্রী ও আমার স্বামী ও আমার-আমার-আমার এসব ব্যাপারে আমার দম্ভ নিয়ে আমার যে-অহং তার সংকীর্ণ গণ্ডী থেকে বেরুতে পারা। এর মানে হচ্ছে এই সবকিছু বিস্মৃত হওয়া এবং প্রসারিত হওয়া তার প্রতি যা আমার বিপরীতে আছে ও যা আমার সামনে আছে, হোক তা একটি শিশু কিংবা ফুল কিংবা বই বা কোনো ধারণা বা মানুষ বা যে কোনো কিছু।

আগ্রহ মানে সক্রিয় হওয়া, তবে এরিস্টটল বা স্পিনোজা যে-অর্থে সক্রিয়তার কথা বলেছেন সে-অর্থে। সক্রিয়তা মানে *ব্যস্ততা (busy-ness)* নয়, সারাক্ষণ কিছু একটা করতেই হবে আধুনিক এ-ধারণাটি নয়। সক্রিয়তার যে-অর্থের কথা এখানে বলছি সে-অর্থে, যে-মানুষটি একেবারে কিছুই না ক'রে দু-এক ঘণ্টা বসে থাকতে পারেন তিনি সম্ভবত আমাদের অনেকে যারা সারাক্ষণ কিছু না কিছু করছি তাদের চেয়ে বেশি সক্রিয়। এ-সক্রিয়তা নিশ্চিতভাবেই অধিকতর দুঃসাধ্য। বাহ্যিক অর্থে নয় বরং এ-আন্তর অর্থে সক্রিয় হতে সমর্থ হওয়াটা বয়স্ক মানুষের জন্যে একটি সত্যিকারের সমস্যা।

কপট কর্মতৎপরতার সমস্যাটিকে উপেক্ষা করা যায় না। শুধু ব্যস্ততার ক্ষেত্রে নয়, অন্য আরেক ক্ষেত্রেও এটা দেখা যায়। লোকে প্রায়ই নিজেদের অনুভূতি বিষয়ে নিজেরাই নিজেদেরকে ভাওতা দেয়। একটি উদাহরণ দিচ্ছি যেটিকে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, কিন্তু তা যে-সমস্যাটায় আমি জোর দিতে চাই তার সাথে সম্পর্কিত ব'লে আমি বিশ্বাস করি: জনাব ক-কে সম্মোহিত করা হচ্ছে। আমরা ধরে নিচ্ছি, এখন সকাল ৯ টা বাজে। সম্মোহনকারী তাঁকে বললেন, আজ বেলা তিনটার সময় তিনি তাঁর গায়ের কোটটা খুলে ফেলবেন, এবং, এর মধ্যে যদি অন্য কোনো অভিভাবন (suggestion) দেয়া না হয়, তাহলে এই ঘটনা ভুলে যাবেন। এবার আমরা ধ'রে নিই যে দুপুর ২:৩০ এর সময় জনাব ক-এর সাথে আপনার দেখা হল। আপনি তাঁর সাথে আবহাওয়া নিয়ে, রাজনীতি নিয়ে, সে-মূহুর্তে যা মন চায় তা-ই নিয়ে আলাপ করলেন। ৩ টা বাজার ঠিক এক মিনিট আগে জনাব ক বলবেন: "আজ কী ভীষণ গরম পড়েছে তাই না? এখন আবার আমাকে কোটটা খুলতে হবে।"

এখন, দিনটা যদি সত্যিই উষ্ণ হয় আপনি একে খুবই যুক্তিসঙ্গত ভাববেন। কিংবা দিনটা যদি হয় খুব ঠাণ্ডা আর তাপনটা (heating) এতো গরম যে আপনি সহ্য করতে পারছেন না, তাহলেও আপনি তাঁর প্রতিক্রিয়াকে যুক্তিসঙ্গত মনে করবেন। তবে, দিনটা যদি খুব বেশি গরম না হয় আর আপনাদের দালানটাও অতি উষ্ণ না হয় সেক্ষেত্রে জনাব ক-এর খুব গরম বোধ করার ঘটনায় আপনি বিস্মিত হবেন। আপনি হয়তো ভাববেন জ্বরের কারণে তাঁর গা গরম হয়েছে, এবং পরামর্শ দেবেন তাঁকে চিকিৎসকের কাছে যেতে। এরপরও, আপনি নিশ্চিত যে জনাব ক গরম বোধ করেছেন এবং কোটটা খোলার তাঁর দরকার পড়েছে। কিন্তু যদি সকাল ৯ টার সম্মোহনের সময়টায় আপনি উপস্থিত থাকতেন, তাহলে জানতে পারতেন যে, গরম বোধ করার পুরো অনুভূতিটাই তৈরি হয়েছে সম্মোহনকারীর অভিভাবনের প্রভাবে। আগ্রহোদ্দীপক ব্যাপার হচ্ছে, তা সত্ত্বেও, জনাব ক-এর নিজের কাজটাকে যৌক্তিক হিসেবে দেখানোর দরকার হয়েছিল। জনাব ক সহজে, স্বত:স্ফূর্তভাবে কোটটা খুলে ফেলতে পারেন নি। না, তাঁকে এর জন্যে একটা যুক্তি খুঁজে পেতে হয়েছে। যদি আপনি সকালে উপস্থিত না থাকেন, আপনি বিশ্বাস ক'রে ফেলবেন যে তিনি সত্যিই উষ্ণ বোধ করেছেন।

অসংখ্য ক্ষেত্রে কোনো রকম সম্মোহন ছাড়াই যা ঘটে এটা শুধু তার মধ্যকার একটি বিশেষ উদাহরণ মাত্র। আমরা এমন কিছুকে অনুভব করেছি ব'লে বিশ্বাস করি যাকে আসলে অনুভব করি নি। এর কারণ স্রেফ এই যে আমরা অভিভাবন, জনমত, ও এ-জাতীয় বিষয়ের পশ্চাদানুসরণ করি। তারপর আমাদের নিজেদের অনুভূতির কারণে সম্পন্ন ব'লে মনে হয় এমন কর্মকাণ্ডের জন্যে আমরা একটি যুক্তি খুঁজে বের করি – আমরা যৌক্তিকীকরণ করি (rationalize)। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি কোনো সংস্কৃতিবান এলিট শ্রেণীর (cultural elite) একজন হন, তাহলে আপনি হয়তো বোধ করবেন যে পাবলো পিকসোর কাজ খুবই সুন্দর আর শিল্পকর্ম হিসেবে মহৎ। কিন্তু যদি আপনাকে দীক্ষিত করা হয় (indoctrinated) যে পিকাসো সুন্দর কিছু একটা সৃষ্টি করেছেন, তাহলে আপনি তাঁর চিত্রকর্মের দিকে তাকিয়ে সেগুলোকে চমৎকার ব'লে বোধ করবেন, যদিও সত্যিকার অর্থে আপনি কিছুই অনুভব করেন নি। যা ঘটেছে তা হচ্ছে কিছু একটা অনুভবের চিন্তা আপনার হয়েছে। একটা প্রকৃত অনুভূতি হচ্ছে একটা বাস্তবতা (reality), যা ব্যক্তির পুরো শারীরবৃত্তিক সংশ্রয়ের মধ্যে ঘটে এমন কিছুর অনুরূপ হয়। আর একটা অনুভূতির চিন্তা প্রায় সত্যিকার অনুভূতির মতো, কিন্তু আসলে তার থেকে আলাদা। অধিকাংশ লোকই একটি প্রকৃত অনুভূতি ও অনুভূতির চিন্তার মধ্যে ঠিক পার্থক্য করতে বা এদেরকে আলাদা করতে জানে না।

কোনো ব্যক্তি যদি তাঁর নিজের মধ্যে বিদ্যমান একমাত্র পরীক্ষাগারটিতে, অর্থাৎ, তাঁর নিজের জীবনে, পর্যবেক্ষণের চেষ্টা চালান তাহলে দেখতে পাবেন যে প্রায়ই তাঁর এমন বিশ্বাস তৈরি হয়েছে যে তিনি একটা কিছু অনুভব করছেন – আগ্রহ, প্রেম, আনন্দ বা অন্যান্য আবেগ – যখন তাঁর আসলে হয়েছে স্রেফ অনুভূতি বিষয়ে চিন্তা।

অন্যদিকে, অনেক সময় ব্যক্তির যে-অনুভূতি হয় তা ছদ্ম-অনুভূতি; সংস্কৃতির দীক্ষা (indoctrination) অনুযায়ী তাঁর যা অনুভব করার কথা তিনি তা-ই অনুভব করেন; অনেক পরিস্থিতিই থাকে যেগুলোতে ব্যক্তি যা অনুভব করার কথা তা-ই অনুভব করেন এবং তিনি যথার্থ অনুভূতিসমূহ ও ছদ্ম-অনুভূতিসমূহের , যা আসলে চিন্তা ছাড়া কিছু নয়, পার্থক্য জানতে পারেন না।

এই ছদ্ম-অনুভূতি এমন কিছু যা সত্যিকার আগ্রহ, সক্রিয় অংশগ্রহণ, প্রসারিত হওয়া এসব থেকে আলাদা। জীবনকে যদি আগ্রহোদ্দীপক করতে হয় তাহলে ব্যক্তিকে আগ্রহী হয়ে ওঠতে হবে। তা না হলে জীবন একঘেয়ে হয়ে ওঠবে এবং হতাশ মানুষ একঘেয়েমি দূর করার জন্যে সব রকম উপায় অবলম্বন করবে। যদিও এটা সত্য যে অচৈতন্য নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয় – এবং সাধারণত লোকে ইডিপাসগূঢ়ৈষা (Oedipus complex), অজাচারী আকাঙ্ক্ষা, এবং এ-জাতীয় সব জিনিস নিয়ে চিন্তা করে – আমি মনে করি লোকে অন্য যে কোনো কিছুর চেয়ে বেশিমাত্রায় যাকে অবদমিত করে তা হল নিজেদের মধ্যে বিদ্যমান একঘেয়েমির বোধ।

অচেতন বিরক্তি (unconscious boredom) আধুনিক সংস্কৃতিতে বিপুল মাত্রায় বিদ্যমান। লোকের অকৃত্রিম অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার এতোটা শূন্য ব'লেই রেডিও, টেলিভিশন ও এ-জাতীয় ভোগের বস্তুর বিস্তর সাফল্য সম্ভব হচ্ছে। আমাদের সমাজে আমরা এটা বিশ্বাস করতে দীক্ষিত হই যে অনাগ্রহী হওয়াটা বেশ অশোভন, বা অন্ততপক্ষে এটা ব্যর্থতার ইঙ্গিতবাহী; "সফল" লোক কিছু না কিছুতে আগ্রহী। এ-কারণে, বিরক্তিবোধকে উত্তেজনার বোধ দ্বারা আমাদের প্রতিস্থাপন করতে হয়; যদিও এ-উত্তেজনা প্রায়ই আসলে একটা চিন্তা ছাড়া আর কিছু নয়, যে-চিন্তাটি কোনো বিশেষ পরিস্থিতি বা ব্যক্তিকে উত্তেজনাকর মনে করতে হবে এ দীক্ষা দানের ফলে প্রণোদিত হয়েছে।

আগ্রহ ও বিরক্তি সম্পর্কে এতোক্ষণ যাবৎ আমি যা বলছি তার সাথে যে-বৃদ্ধদের ব্যস্ত থাকার উপায় নেই ও হাতে প্রচুর সময় আছে তাঁদের সমস্যার যোগসূত্র তৈরি করা যায় সহজেই।

বার্ধক্যযাত্রার আরেকটি মনস্তাত্ত্বিক দিক হচ্ছে এ-ঘটনা যে প্রায়ই ব্যক্তির আসল চরিত্র প্রকাশ পায় তার বৃদ্ধ বয়সে। যে-সময়ে তিনি কর্মব্যস্ত ছিলেন, তাকে চিত্তাকর্ষক থাকতে হয়েছে, চাকুরি খুঁজতে হয়েছে, ও চাকুরি রক্ষা করতে হয়েছে তার তুলনায় বৃদ্ধ বয়সটাতেই তার চরিত্র অধিকতর সঠিকভাবে পরিস্ফুট হয়। কখনো কখনো লোকজন মনে করে বার্ধক্যযাত্রারত ব্যক্তির স্বয়ংক্রিয়ভাবেই অবনতি ঘটে। কিন্তু কোনো অবনতি এখানে অনিবার্যভাবে নেই। এ পর্যন্ত তাঁকে প্রয়োজনের খাতিরে উদ্যমীভাব সহকারে নিজেকে উপস্থাপন করতে হয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনটা যখন থাকল না, তখন যে-অবনতির মধ্যে বরাবরই তিনি ছিলেন তা সত্যি সত্যি প্রকাশ ক'রে ফেললেন।

আমরা সবাই জানি যে আমাদের মধ্যে সবাই না হলেও অনেকেই মনোবিজ্ঞানীরা কখনো কখনো যাকে persona বলেন তা উপস্থাপন করতে চাই – যে-রকম কাজ করছি তার সাথে সবচেয়ে ভালোভাবে খাপ খায় নিজেদের এমন একটি ছবি আমরা উপস্থাপন করতে চাই। অবশ্য, কোনো ব্যক্তি যদি হন একজন শল্যচিকিৎসক এবং খুব ভালো শল্যচিকিৎসক তাহলে সেরকম কোনো ভাবমূর্তি দেখানোর তাঁর দরকার হয় না। প্রথমত, রোগী শল্যচিকিৎসককে দেখারই সুযোগ পান না, দ্বিতীয়ত, তিনি ভালো একজন শল্যচিকিৎসক পেয়ে এতোই খুশি থাকেন যে চিকিৎসক হাসলেন কি হাসলেন না এ নিয়ে তাঁর মাথাব্যথা থাকে না। যদি আপনি কোনো ইস্পাত কারখানার শ্রমিক হন তাহলেও খুব চিত্তাকর্ষক হবার দরকার হবে না আপনার, কারণ এক্ষেত্রে আপনার দক্ষ হওয়া এবং আপনার সহকর্মীদের আপনার ওপর আস্থাশীল হতে পারারই কেবল গুরুত্ব আছে। তথাপি, আমাদের আমলাতান্ত্রিকভাবে বিন্যস্ত সমাজে অধিকাংশ কাজ ও পেশার ক্ষেত্রেই চিত্তাকর্ষক হওয়াটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, কখনো এমনকি দক্ষতার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যদি আপনার দুটোই থাকে, নিশ্চয়ই, তা এক মহাসম্পদ, তবে চিত্তাকর্ষক ভাবটি খুব গুরুত্বপূর্ণ।

তবে, যখন আপনার আর চিত্তাকর্ষক হবার বাধ্যবাধকতা নেই, তখন আপনি অপ্রীতিকর হবেন না কেন? কেন অবশেষে বোধ করবেন না: এখন আমি আমার মতো হতে পারি। এ কথা দ্বারা এটা বোঝাচ্ছি না যে মহা বড়সংখ্যক লোকই হচ্ছে অপ্রীতিকর, তবে বেশ অনেক লোকই তাই; এবং

বয়স্ক লোকেদের মধ্যে অনাকাঙ্ক্ষিত যা-কিছু দেখা যায় তার সবই বৃদ্ধ বয়সের দরুণ সৃষ্ট অবনতির ফল এমন মনে করাটা ভুল। বস্তুতপক্ষে, এ-বৃদ্ধদের মধ্যে অনেকেই প্রথম বারের মতো ভান না ক'রে নিজের মতো থাকার স্বাধীনতা পেয়েছেন।

কিন্তু এটা শুধু যে অপ্রীতিকর স্বভাবের লোকেদের জন্যে সত্যি তা নয়, খুব সদয় ধাঁচের লোকেদের জন্যেও তা সত্যি। ব্যবসার মধ্যে আপনি যদি খুব সদয় ভাব বজায় রাখেন তাহলে আপনি নির্বোধ ব'লে গণ্য হবেন; এবং আপনার সাথে লোকের সম্পর্কের মধ্যে লোকে যে-মনোভাব প্রকাশ করবে তার দ্বারা এ বিষয়ে তারা আপনাকে সজাগ করবে। ফলস্বরূপ, আপনার অন্তরের পরদুঃখকাতরতার জন্যে আপনি লজ্জিত হবেন। এর কারণ, কোনো পণ্যদ্রব্য আপনি হয়তো কাউকে দিতে চান যার তা কেনার সামর্থ্য নেই, কিন্তু আপনি দেখলেন যে আপনাকে এ-অনুভূতিটা অবদমিত করতে হবে – কারণ যদি আপনি তা করেন, যদিও আপনার তা করবার সামর্থ্য আছে, এমন মাত্রায় আপনাকে দীক্ষিত করা হয়েছে যে আপনি নির্বোধ ব'লে গণ্য হবেন।

তবে, যখন আপনি বৃদ্ধদশায় আছেন তখন এ-সদর্থক অর্থে নিজের প্রকৃত সত্তার (true self) অনুরূপ হবার স্বাধীনতা আপনি বোধ করবেন। সুতরাং অতীতে বিশেষ বিশেষ সামাজিক পরিস্থিতিতে যতোটা দয়াবান হবার অনুমোদন আপনার জন্যে ছিল তার চেয়ে বেশি দয়াবান আপনি হতে পারবেন।

আমি যা বোঝাতে চাইছি তা হচ্ছে, ভালো-মন্দ যাই হোক, বৃদ্ধ লোকেরই সুযোগ ঘটে – এবং প্রায়শ সে-সুযোগ তিনি ব্যবহার করেন – সাফল্য লাভের প্রয়োজনে ধারণ করা ঈপ্সিত চরিত্রের বদলে নিজেকে নিজের সত্যিকার চরিত্র অনুযায়ী জীবন যাপন করতে দেয়ার।

অতএব, বৃদ্ধ লোকেদের বোঝার যেকোনো চেষ্টার ক্ষেত্রে, আমি মনে করি, চরিত্র কাঠামোর বিভিন্ন রূপ বোঝাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ – যেমন এটা গুরুত্বপূর্ণ তরুণদেরকে বোঝার ক্ষেত্রে। আমার প্রস্তাব হচ্ছে, বৃদ্ধদের বিষয়ে কোনো গবেষণার সাথে জড়িত থাকতে হবে চরিত্র কাঠামো ও চরিত্রের বিভিন্নতা বিষয়ে গবেষণা। যাঁরা জীবনকে ও যা-কিছু প্রাণবন্ত তাকে ভালোবাসেন তাঁদের সাথে চরিত্রগত দিক থেকে এক বড় পার্থক্য রয়েছে তাঁদের যারা, ভ্রষ্টপথে গিয়ে, মৃত্যুকে ভালোবাসেন – আকৃষ্ট হন ক্ষয় দ্বারা, যা-কিছু নিষ্প্রাণ তার দ্বারা।

এ-বিষয়ে আমি *The Heart of Man* গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি, এবং সেখানে আমি যা বলতে চেষ্টা করেছি তার মূল কথাগুলো সংক্ষেপে এখানে উল্লেখ করবো। অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করেন যে সব মানুষই জীবনকে ভালোবাসে। দুর্ভাগ্যবশত, এটা সত্য নয়। সংখ্যালঘু একটি দল আছে যাঁরা যা-কিছু প্রাণবন্ত তার বদলে সত্যিকারভাবে অধিকতর আকৃষ্ট হন ক্ষয় দ্বারা, যা-কিছু যান্ত্রিক তার দ্বারা, যা-কিছু প্রাণবন্ত নয় তার দ্বারা। এ দু-দলকে পৃথক করার জন্যে আমি necrophilia ও biophilia, মৃত্যুপ্রেম ও জীবনপ্রেম, শব্দদ্বয়কে ব্যবহার করেছি।

কোনো মায়ের মধ্যে নেক্রোফিলাস ধরনের দৃষ্টান্ত আপনি দেখতে পান, উদাহরণস্বরূপ, যখন সে-মা তাঁর সন্তানের অসুস্থতা বিষয়ে বলতে গিয়ে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠেন। যদি সন্তান কোনোকিছু খুব উপভোগ ক'রে থাকে আর প্রাণশক্তিতে পূর্ণ হয়ে বাসায় আসে তাহলে সেটা তিনি প্রায় লক্ষই করবেন না। কিন্তু সন্তান যখন অসুস্থ তিনি তখন বেশ আগ্রহী হয়ে উঠবেন। এমনকি এ-আচরণকেও আপনি ক্ষমা করতে পারেন, কারণ অন্ততপক্ষে মায়ের ক্ষেত্রে তাঁর সন্তানের স্বাস্থ্য বিষয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠার কিছু হেতু আছে। তবে, আপনি অনেক লোককেই পাবেন যাঁরা সবচেয়ে বেশি আগ্রহী সমাধিস্থকরণ-মৃত্যু-অসুস্থতা বিষয়ে, যাদের প্রিয় আলোচ্য বিষয় নিজেদের অসুস্থতার ইতিহাস; এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে তরুণদের তুলনায় বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে এটা অধিকতর মাত্রায় যৌক্তিকীকৃত ভাবনাতে (rationalized preoccupation) পরিণত হয় সহজেই।

বুড়ো হবার সাথেসাথে আমরা চিকিৎসাবিদ্যার পাঠ নিতে শুরু করি। আমাদের একটা কোনো অসুখ হয়, তারপর অন্য একটা হয় এবং শীঘ্রি আমরা চিকিৎসাবিদ্যার বিভিন্ন শাখায় বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠি (তবে, আশা করি যে, খুব বেশি শাখায় নয়)। এখন, নেক্রোফিলাস ব্যক্তি যখন দেখেন যে তিনি হয়তো আর শুধু দশ বা পনেরো বছর বাঁচবেন এবং যখন মৃত্যু তাঁর কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠে তখন তিনি বোধ করেন যে নিজের নেক্রোফিলাস প্রবণতাগুলো তাঁর আর অবদমিত করার দরকার নেই। এখন তিনি খোলাখুলিভাবেই, অসুস্থতা ও মৃত্যু নিয়ে উৎসাহী হতে পারেন। তিনি শুধু যে বিরক্তিকর ব্যক্তিতে পরিণত হন তা নয়, বরং সোল্লাসে বিষণ্নতার আবহ ছড়িয়ে দিয়ে নিজের চারপাশের মানুষদের জন্যে তিনি সত্যিকার বিপদের কারণ হন। তাঁর জন্যে, নিশ্চিতভাবেই, এটা সত্যিকার অর্থে বিষণ্নতা নয়। তাঁর কাছে অসুস্থতা ও মৃত্যু নিয়ে ভাবাটা জগতের সবচাইতে রোমাঞ্চকর বিষয় – কিন্তু যেসব মানুষ জীবনকে ভালোবাসেন তাঁদের জন্যে এটা ভয়ানক।

এখন, আপনি যদি না জানেন যে, আপনি যা নিয়ে কাজ করছেন তাকে আপনি, বৃহৎ অর্থে, বলতে পারেন অসুস্থতা, সেক্ষেত্রে এই বিষণ্নতার আবহে আক্রান্ত হয়ে যেতে পারেন আপনি – বিশেষত যদি যে-লোকটি অসুস্থতা বিষয়ে কথা বলা থামাতে পারছেন না তাঁর প্রতি আপনার সমবেদনা থাকে।

আমি মনে করি, বয়োবৃদ্ধদের নিয়ে সত্যি যদি কারো মাথাব্যথা থাকে তাহলে তার এ বিষয়ে খুবই সজাগ থাকা উচিত যে এই অসুস্থতা, মৃত্যু ও সমাধিস্থকরণ নিয়ে ব্যাপৃত থাকাটা মোটেও স্রেফ বুড়ো হবার স্বাভাবিক ফল নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, এটা সে-প্রবণতার অধিকতর অকপট প্রকাশ বা প্রস্ফুটন যা এই লোকেদের মধ্যে সমস্ত জীবনব্যাপীই বর্তমান ছিল। নির্দিষ্ট ক'রে বললে প্রবণতাটি হল – যা-নিয়ে রোমাঞ্চিত হওয়া অনুচিত তা-নিয়েই রোমাঞ্চিত হওয়া – ক্ষয়।

বয়স্কযাত্রার সাথে সম্পর্কিত আরেকটি মনস্তাত্ত্বিক মনোভাব স্বনির্ভরতা (independence) ও পরনির্ভরতার (dependence) পার্থক্যের সাথে জড়িত। আমরা সবাই স্বনির্ভর। আমাদের সবার চাকুরি আছে এবং আমরা আর পিতামাতার কাছ থেকে অর্থ নিই না। আবার আমরা পরনির্ভরও: আমরা

আমাদের নিয়োগকারীর ওপর, জনমতের ওপর, কিংবা, চিকিৎসকদের ক্ষেত্রে, তাঁদের রোগীদের ওপর নির্ভরশীল। তথাপি, নিজেদেরকে আমরা স্বনির্ভর ব'লে বোধ করি যখন কোনো না কোনোভাবে নিজেদের অর্থ নিজেরাই উপার্জন করি।

দুর্ভগ্যবশত, স্বনির্ভরতা বা স্বাধীনতা আপাতভাবে যতোটা মনে হয় ততো সহজে অর্জন করা যায় না। ব্যক্তির বিকাশের অন্যতম একটি সমস্যা হচ্ছে মনস্তাত্ত্বিক ভাষায় যাকে বলা যেতে পারে স্বাতন্ত্রীকরণের সমস্যা (problem of individuation): কীভাবে একজন মানুষ মাতৃগর্ভের একটি ভ্রূণ থেকে একজন স্বনির্ভর মানুষে বিকাশ লাভ করতে সমর্থ হয়?

এটা, সবাই জানেন, এক দীর্ঘ প্রক্রিয়া। স্পষ্টতই, যতোক্ষণ আমরা আমাদের মায়ের গর্ভে থাকি, ততোক্ষণ, খুবই স্পষ্ট শারীরবৃত্তিক অর্থে, আমরা স্বনির্ভর নই। এরপর, যখন আমরা ভূমিষ্ঠ হই সেসময় শারীরবৃত্তিকভাবে আমরা স্বনির্ভর, কিন্তু মানসিকভাবে নয়। বস্তুতপক্ষে, জন্মের পরের প্রথম কয়েক সপ্তাহে আমাদের অস্তিত্ব কোনো কোনো দিক থেকে আমাদের প্রাপ্তবয়স্ক জীবনের তুলনায় ভ্রূণাবস্থার জীবনের বেশি কাছাকাছি হতে পারে। সেসময় আমরা মায়ের ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল থাকি। আমরা তাকে ভিন্ন কোনো ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি না। আমরা মায়ের সাথে, আমি বলবো, মিথোজীবিতার সম্পর্কে আবদ্ধ (symbiotically related) থাকি। তখন পর্যন্ত *আমি* ও *ন-আমি* (*not me*) এর মধ্যে পার্থক্য থাকে না। শিশুর কাছে পুরো জগতটাই *আমি* (*me*), এবং যদি কোনো মা তাঁর চার-সপ্তাহ-বয়সের বাচ্চার কাছ থেকে ভালোবাসা প্রত্যাশা করেন, তাহলে বলতে হবে তিনি অলীকরাজ্যে বাস করছেন। বস্তুত, তিনি যদি তাঁর এক-বছর-বয়স্ক বাচ্চার কাছ থেকে প্রচুর ভালোবাসা প্রত্যাশা করেন, তাহলে তিনি কিছুটা বিভ্রান্তও এবং তিনি এগোচ্ছেন সমস্যা অভিমুখে ।

আমি হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াটি মানব বিকাশের অন্যতম মৌলিক একটি রূপ। *আমি* মানে একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি যিনি জগতের সাথে সম্পর্কিত, যিনি জগতের প্রতি আগ্রহী, কিন্তু যিনি স্বনির্ভর, যাঁর অস্তিত্বের কারণ তিনি নিজেই।

খুবই অসুস্থ লোকজন প্রথম মিথোজীবিতার ধাপটিকে অতিক্রম করতে পারেন না। এই মনোবিকলনগ্রস্ত (psychotic) লোকেদের মধ্যে একটি বিশেষ প্রকার আছে যে-প্রকারের ব্যক্তি আবেগীয়ভাবে ও কার্যকরভাবে এখনো মায়ের গর্ভে বাস করতে চান, এখনো মায়ের সাথে বা মায়ের স্থান অধিকারকারী কোনো ব্যক্তির সাথে মিথোজৈবিকভাবে (symbiotically) যুক্ত থাকতে চান।

আপনি এমন লোক পাবেন যারা এমন এক পর্যায়ে পৌছোঁয় যেখানে তারা শুধু মাতৃস্তন্য পান করতে চায়, কিংবা কিছুটা অগ্রসর অন্যরা, মায়ের কোলে বসে থাকতে চায়, এবং আরো একটু অগ্রসর অন্যরা আছে যারা চায় মাতা বা পিতা তাদের হাতে ধ'রে রাখবেন। তো, ব্যক্তি যদি পূর্ণ পরিপক্বতায় পৌছান তাহলেই কেবল তিনি সত্যিকার আত্মনির্ভরতা অর্জন করবেন; অর্থাৎ তিনি নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হবেন, কারণ তিনি যথার্থ উপায়ে জগতের সাথে যুক্ত আছেন, কারণ অন্য কোনো ব্যক্তির অংশ হয়ে নয়, বরং বাইরের জগতের প্রতি তাঁর আগ্রহ ও ভালোবাসা দিয়ে তিনি জগতের সাথে যুক্ত আছেন। তিনি সত্যিকারভাবে স্বনির্ভর হতে পারবেন, কারণ তিনি সম্পর্কযুক্ত (related); কিন্তু অধিকাংশ লোকই এই পর্যায় পর্যন্ত পৌছুতে পারেন না।

আপনি এমন অনেক লোক পাবেন যাঁরা সামাজিকভাবে ও অর্থনৈতিকভাবে খুব ভালো আছেন, অথচ স্বনির্ভর নন। এই স্বনির্ভরতার অভাব বাইরে থেকে চোখে পড়ে না, কারণ তাঁদের এমন অবস্থান আছে যাকে খুবই স্বনির্ভর ব'লে মনে হয়। এটা ঘটে বহু ব্যবসায়ী বা পেশাজীবীদের ক্ষেত্রে যাঁরা তাঁদের সেক্রেটারি, স্ত্রী, বা জনমতের ওপর নির্ভরশীল, এবং তথাপি, সচেতনভাবে তাঁরা বোধ করেন, তাঁরা প্রকৃতই স্বনির্ভর।

বুড়োদের ক্ষেত্রে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রাসঙ্গিকতায় আমি আবারো জোর দিতে চাই। কারণ প্রায়ই এটা মনে হয় যে, প্রথমে নেক্রোফিলিয়া ও বায়োফিলিয়ার ক্ষেত্রে যেমন বলা হয়েছে, একজন বয়স্ক মানুষ পরনির্ভরতার অনেক লক্ষণ প্রদর্শন করেন এবং লোকে মনে করে এটা স্রেফ বুড়ো হবার কারণে হয়েছে, যদিও, বস্তুত, এই লোকটি বরাবরই পরনির্ভর প্রকৃতির ছিলেন, এবং কেবল এখন এটা প্রকাশের অবস্থা তাঁর হয়েছে, যেহেতু বুড়ো মানুষ হিসেবে তাঁর কিছুটা পরনির্ভরশীল হবারই কথা। এখানে আপনি বিশেষ এক শ্রেণীর বৃদ্ধ লোকেদের, যারা নিজেদের অক্ষম ব'লে বোধ করেন এবং তাঁদের রক্ষার জন্যে অন্য লোকজনের দরকার বোধ করেন, পুরো মনস্তত্ত্বটা বুঝতে পারছেন। বৃদ্ধ বয়স, আমাদের সংস্কৃতিতে আমরা একে যেভাবে দেখি, তাঁদেরকে এক অপূর্ব সুযোগ এনে দেয় এবং যুক্তি যুগিয়ে দেয় নিজেদের মধ্যকার পরনির্ভরশীল প্রবণতা অনুযায়ী আচরণ করার, যে-পরনির্ভরশীলতা ত্রিশ বা চল্লিশেও তাঁদের মধ্যে ছিল, কেবল সেসময় ছিল অচৈতন্যে ও গোপনে; কিন্তু এখন তাদের সুযোগ হয়েছে সব পরনির্ভরশীলতা ব্যক্ত করার।

আবারো, এখানে সমস্যাটা হচ্ছে, এ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে না গিয়ে একে ঠিকভাবে দেখা; অর্থাৎ, এ হচ্ছে এমন এক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যা সর্বদাই বর্তমান ছিল এবং যার বিরুদ্ধে এখন পাল্টা ব্যবস্থা নিতে হবে, কিংবা এমনকি হয়তো সারিয়ে তুলতে হবে, কিন্তু একে বৃদ্ধ বয়সের লক্ষণ হিসেবে নেয়া যাবে না।

আরো অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চারিত্রিক বৈশিষ্টাবলী ও চরিত্রগত পার্থক্যসমূহ আছে যেগুলো কখনো কখনো বৃদ্ধ বয়সে নিজেদের প্রকাশ করে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো ব্যক্তি ঈর্ষা প্রদর্শন করতে পারেন। যতোক্ষণ তিনি তরুণ ছিলেন, তাঁর ঈর্ষা কিছুটা নিয়ন্ত্রিত বা অবদমিত ছিল, কারণ ঈর্ষান্বিত হওয়ার ব্যাপারটা উত্তম ভাবমূর্তি সৃষ্টি করে না। বস্তুত, যদি তিনি, ধরা যাক অধস্তন নির্বাহী পরিচালক হিসেবে, সামনে এগোতে চেয়ে থাকেন, তবে তাকে এটা লুকোতে হয়েছে। ঈর্ষান্বিতের চেহারার বদলে বরং তাঁকে বিপরীত কোনো চেহারা নিয়ে থাকতে হয়েছে।

তবে, এই একই ব্যক্তি যখন বুড়ো হন, যে-ঈর্ষা তাঁর ভেতরে সর্বদাই বর্তমান ছিল তা দৃশ্যমান হয়ে ওঠে – এবং তা আরো জোরালো হয়ে ওঠার রসদ পায়। এরকম ব্যক্তি এখন তরুণদের প্রতি কিংবা যে-বৃদ্ধদের হয়তো গুরুতর কোনো অসুখ হয়নি তাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হতে পারেন। আবারো, এখানে সমস্যাটা হচ্ছে বৃদ্ধদশার কারণে আবির্ভূত ঈর্ষা দ্বারা বিভ্রান্ত না হওয়া; বরং এটা জানা যে এ-চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটি এখন বিদ্যমান আছে যেহেতু এটা এখন নিজেকে সচেতনভাবে প্রকাশ করার বা আচরণে ব্যক্ত করার সুযোগ পেয়েছে। ব্যক্তিটি সবসময় যা ছিলেন তা-ই আছেন।

এখন, আপনি হয়তো ভাবছেন, যে-মনস্তাত্ত্বিক বিবরণ এতোক্ষণ আমি দিলাম তা যদি সঠিক হয়, তাহলে এক্ষেত্রে করণীয় কী আছে। প্রথমত, আমি মনে করি, বহু চরিত্রগত অভিব্যক্তি (characterologicl manifestations) যেগুলোকে বয়সজাত অভিব্যক্তি (manifestations of age) মনে করা হয়, সেগুলো আসলে সর্বদাই বিদ্যমান থাকা প্রচ্ছন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য – এ সত্যটা শনাক্ত করাটাই এই চারিত্রিক বৈশিষ্টগুলোর প্রতি প্রত্যুত্তর করা ও প্রতিক্রিয়া করার ক্ষেত্রে একটি সহায়ক কাজ হবে। দ্বিতীয়ত, আমি বলবো, পঁয়ষট্টি-উর্ধ্ব কোনো ব্যক্তির পক্ষে পরিবর্তিত হবার ব্যাপারটা খুব বেশি বিলম্বিত কিছু হবে না। একজন ব্যক্তির পরিবর্তিত হবার মাত্রা বা সম্ভাব্যতা মুখ্যত তাঁর বয়সের ওপর নির্ভর করে না। এটা নির্ভর করে তাঁর প্রাণশক্তি, পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা, তাঁর আগ্রহ, ও অন্য আরো অনেক বিষয়ের ওপর।

একুশ-বছরের এমন তরুণ আছে, যাদের সম্পর্কে, সর্বজ্ঞ হবার চেষ্টা না ক'রেই, বলা যেতে পারে যে তারা কখনোই পাল্টাবে না, কারণ কোনো একটা উপকরণের ঘাটতি আছে। তারা বিশ বা ত্রিশ যা-ই হোক ব্যাপার একই থাকবে, সারা জীবন ধ'রে তারা একই রকম আনাড়ি হয়ে থাকবে। আমি সত্তর বছর বয়স্ক এমন লোকেদের দেখেছি যাঁরা তাঁদের পুরো জীবন পাল্টে ফেলেছেন, কারণ, সত্তরেও তাঁদের বিপুল প্রাণশক্তি ছিল এবং, বস্তুত, সে-বয়সে তাঁরা শেষপর্যন্ত সত্যিকার পরিবর্তন ঘটানোর ও তাঁরা কী হতে চেয়েছিলেন তা বিবেচনা করার প্রথম সুযোগ পেয়েছিলেন। আমি বিশ্বাস করি না যে বৃদ্ধ বয়স নিজেই অনিবার্যভাবে চরিত্রের মৌল পরিবর্তনের প্রতিবন্ধক একটা ব্যাপার।

এখানে আমি যা-বলছি তা হচ্ছে, বার্ধক্যযাত্রার ফলে আবির্ভূত কিছু বিশেষ চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়, যেখানে, বস্তুত, এগুলো সর্বদাই ব্যক্তির অংশ ছিল। উপরন্তু, যদি কোনো বৃদ্ধ লোকের ইচ্ছা, শক্তি, প্রাণপ্রাচুর্য ও সাহস থাকে, সেক্ষেত্রে তাঁর পরিবর্তিত হবার সক্ষমতা বিষয়ে কারো অনাবশ্যকভাবে সন্দিহান থাকা উচিত নয়।

তবে, পূর্বে যেমনটি বলেছি, কোনো বৃদ্ধের সম্পূর্ণ এক ভোক্তায় রূপান্তরিত হওয়াটা আমাদের রোধ করতে হবে। তাকে এমন ব্যক্তি হিসেবে তৈরি করতে হবে যাকে আমরা শেখাবো কী ক'রে নিজের শেষ বিদায় মানে মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষার সাথেসাথে ভালোভাবে সময় অতিবাহিত করা যায়। অতএব, বৃদ্ধ ব্যক্তির প্রতি আমাদের কোনো রকম অবজ্ঞা থাকা উচিত নয়, অন্ততপক্ষে একজন তরুণের প্রতি যতটুকু থাকতে পারে তারচেয়ে বেশি বা কম নয়। অবজ্ঞা কারো বেলাতেই ন্যায়সঙ্গত ব'লে আমি মনে করি না। যে-ব্যক্তি জীবনে ব্যর্থ হয়েছেন এবং যাঁর ব্যর্থতার প্রতিকারের কোনো উপায় নেই তাঁর প্রতি আপনার সমবেদনা থাকতে পারে। কিন্তু ত্রিশ-চল্লিশ বছরের এমন বহু লোকের প্রতি আমাদের সমবেদনা থাকতে পারে যাঁদের সম্পর্কে ইতোমধ্যে আমরা বলতে পারি যে তাঁরা জীবনে ব্যর্থ হবেন ও তাঁদের কোনো প্রতিকার থাকবে না।

এটা বৃদ্ধ বয়সের সমস্যা নয়; এটা মানব অস্তিত্বের সমস্যা যা রয়েছে আমাদের প্রত্যেকের জন্যেই। আমি বিশ্বাস করি যে কীভাবে আমরা বৃদ্ধ লোকেদের আরো সক্রিয় বোধ করতে ও আরো আগ্রহী বোধ করতে ও যে-নিষ্ক্রিয় ভোক্তাজীবনে প্রায়শ তাঁদের প্রলুব্ধ করা হয় তাকে অগ্রাহ্য করতে সহায়তা করতে পারি – এ সমস্যা বিষয়ে আরো চিন্তা করা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

আমি জানি, এই ক্ষেত্রে, সাধারণভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে যেমন তেমনি, এখনো প্রচুর গবেষণা করতে হবে। বস্তুত, এ দুই ক্ষেত্র খুব বেশি ভিন্ন নয়। যে-তরুণ ছাত্র লেকচার শুধু ভোগ করে তাকে কী ক'রে আপনি এমন ব্যক্তিতে রূপান্তরিত করবেন যে তার অধ্যয়নের বিষয়ের প্রতি সক্রিয়ভাবে আগ্রহী? এই একই সমস্যা রয়েছে বৃদ্ধদের জন্যেও। তিনি এতোদিন যতোটা প্রাণবন্ত ছিলেন তার থেকে কম প্রাণবন্ত করার বদলে কীভাবে আপনি তাঁকে আরো বেশি প্রাণবন্ত ক'রে তুলতে পারেন? এই ক্ষেত্রে গবেষণা খুব কাজের হবে। কীভাবে আপনি আরো সক্রিয় আগ্রহ জাগ্রত করেন? এটা কি আলোচনা, পঠন, শিল্পকলায় নতুন আগ্রহ, বা এমনকি রাজনীতিতে নতুন আগ্রহের সাহায্যে করা হয়? রাজনীতির উল্লেখ আমি এ-অর্থে করছি না যে যে-খবরের কাগজ আপনি পড়ে থাকেন তা পড়া আর তারপর যা পড়েছেন তার সব ঠিক আছে মনে করা, বরং আমি বোঝাচ্ছি – জাগ্রত হবার মাধ্যমে বিবেচনাপ্রসূত মতামত তৈরি, ঘটনাবলীর দিকে বিচারমূলকভাবে তাকানো ও বাস্তবতাকে দেখা, এবং দায়িত্ব বোধ করা, অর্থাৎ যা চলছে তার প্রতি সাড়া দেয়া, যা ঘটছে মানুষ হিসেবে তার প্রতি সাড়া দেয়া।

মোদ্দাকথা, বৃদ্ধ ব্যক্তির উচিত একজন তরুণের মতোই তার চারপাশের জগতের প্রতি আরো বেশি উৎসাহী হওয়া; আর উৎসাহী হওয়া (to be interested) ও দায়িত্বশীল হওয়া (to be responsible) একই কথা – উভয় শব্দই যে-শব্দমূল থেকে উদ্ভূত হয়েছে তা হচ্ছে respondere (সাড়া দেয়া বা to respond)। বৃদ্ধ মানুষের শেখা দরকার কী ক'রে *recreation* (বিনোদন) হয়ে উঠতে পারে *re-creation* (পুনসৃজন) – সৃষ্টিশীল হবার এক নতুন সামর্থ্য – এবং সেজন্যে তার চিত্রশিল্পী বা কবি হওয়া কিংবা কোনো পেশায় থাকার দরকার নেই। তার যা দরকার তা হচ্ছে প্রাণবন্ত হওয়া; তার মানে, জগতের প্রতি সত্যিকারভাবে ও সাধারণভাবে(generally) আগ্রহী হওয়া।

অনুবাদক ঃ ***সাহিদ সুমন*** (প্রভাষক, দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়)